ভাববার কথা

(১)

ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান-সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী -- দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণবর্ণ ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নাউক -- কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ-উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন -- 'বলি বাপু হে, ও বেসুর বেতাল কী চীৎকার ক'রছ!' ক্ষিপ্র উত্তর এল -- 'সুর-তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী -- 'হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মক কিনা! পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিসনি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'

ভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন: তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী; থেকে থেকে বিকট চিৎকার: আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা -- ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির ডোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু-চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!

ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী -- সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্বসম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে -- তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না, মারেনও না' -- এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান! কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলাপুরীর আত্মৈকানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয় -- যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্খানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরীজীর মতে গৃহস্থের মতো ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভারবৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজীকে আমাদের চেয়ে আহাম্মক ঠাওরেছেন।

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ -- 'সে সোজা কথা, মশায় -- আমি সকলকে উপদেশ করি।'

রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?

----

(২)

লক্ষ্ণৌ শহরে মহর্রমের ভারী ধুম! বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বে-সুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরানী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ 'সিয়া'দের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে -- সে ছাতিফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের -- যেমন পাড়াগাঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে -- 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অতদুর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরলসিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ্ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হয়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এল -- ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্র গতি। উল্টা সমঝ্লি রাম -- ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্বিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি -- 'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখ্ব? ভল্ বাবা অজিদ, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত।' (ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ, এমনি মেরেচো শালাদের -- কি আজও কাঁদছে!!)

সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির -- সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি -- নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে যার এক-একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেই দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কান্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুন্ডু, একশত হাত, দু-দশ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই -- যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ -- শাস্ত্রসকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞসা করলুম -- তবে এ দেবতার নাম কি? উততর এল -- এঁর নাম 'লোকাচার'। আমার লক্ষ্ণৌ-এর

ঠাকুরসাহেবের কথা মনে পড়ে গেল: 'ভল্ বাবা ''লোকাচার'' অস্ মারো' ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য -- মহাপন্ডিত, বিশ্বব্রহ্মান্ড খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্তিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐ রকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃশণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ[1] দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ -- সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠেছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকো। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে -- বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে তাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদের আদর! 'ভল্ বাবা ''অভ্যাস'' অস্ মারো' ইত্যাদি।

[1] দ্বিরাগমন